বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-১

রামগড় স্থলবন্দর অবোকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প

স্থানঃ মৌজা-রামগড়, জে এল নং - ২২৯, উপ-জেলা-রামগড়, জেলা-খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

আর্থিক সহযোগিতায় ঃ বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক

পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন (সংশোধিত)

জুন, ২০২১

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

ভূমিকা ঃ বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-১ (বিআরসিপি-১) এর অর্থায়নের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক গ্রুপের সদস্য ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (আইডিএ) থেকে ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ পেয়েছে, যা বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ (বিএলপিএ), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (এমওসি) যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে। বিআরসিপি-১ উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে বাণিজ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন, লজিস্টিক জটিলতা কমানো এবং সীমান্ত ব্যবস্থাপনা ও বাণিজ্য সুবিধার আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করা, যা প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যের জন্য অপরিহার্য। বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ বর্নিত প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত রামগড় স্থল বন্দরের অবকাঠামো নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন, পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন, টেকসই নক্সা ও দরপত্র দলীল প্রস্তুতির নিমিত্তে বর্তমান পরামর্শ সেবার নিয়োগ প্রদান করেন।

প্রস্তাবিত রামগড় স্থল বন্দরের জন্য ১০.০০ একর জায়গার প্রস্তাব করা হয়েছে যার জমি অধিগ্রহন প্রক্রিয়া চলমান। অধিগ্রহনকৃত জমির মালিকানার মধ্যে কিছু আদিবাসীও আছে তাই বিশ্বব্যাংকের সামাজিক সুরক্ষা নীতি OP/BP 4.10 ট্রাইবাল প্লান ও OP/BP 4.12 অনৈচ্ছিক নিস্পত্তি (ক্ষতিপূরণ যোগ্য) ছাড়াও OP/BP 4.01 পরিবেশগত প্রভাব নিরীক্ষা নীতি প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রকল্পের শ্রেণীবিভাগ (তপসিল-১) এর অন্তরভুক্ত নয় কিন্তু অন্যান্ন স্থল বন্দরের প্রাপ্ত পরিবেশ ছাড়পত্র অনুযায়ী প্রকল্পটি ”কমলা খ” শ্রেণীতে বিবেচিত।

নীতি, আইনি প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো ঃ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (ইসিএ, ১৯৯৫) বাংলাদেশের পরিবেশ সুরক্ষা সম্পর্কিত প্রধান আইনগত কাঠামো। এই আইনের আধিনে পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মানের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ এবং সেই সাথে পরিবেশ দূষণ কমানোর জন্য আইন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী, ২০১০ সালে সংশোধিত পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা (ইসিআর) ১৯৯৭-এ প্রদত্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রকল্পটি শুরু করার আগে প্রস্তাবিত প্রকল্পকে পরিবেশ অধিদপ্তর (DoE) থেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র পেতে হবে। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা অনুযায়ী পরিবেশগত অনুমোদনের উদ্দেশ্যে প্রকল্পসমূহকে বিভিন্ন শ্রেণীতে (সবুজ, কমলা-ক, কমলা-খ এবং লাল) শ্রেণীবদ্ধ করে। স্থলবন্দর নির্মাণ, ইসিআর এর বিভিন্ন শিল্প বা প্রকল্পের শ্রেণীবিভাগের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নেই। অন্যান্য স্থল বন্দরের জন্য পাওয়া পরিবেশগত ছাড়পত্র এবং সেসব বন্দরের সাথে জড়িত কাজের পরিধি সম্পর্কে বিএলপিএ-এর পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে, আশা করা যায় যে বিদ্যমান স্থল বন্দরের উন্নয়নের কাজ ‘কমলা খ’ শ্রেণীতে পড়বে। প্রকল্পটি ‘কমলা খ’ হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করে বিএলপিএ ইতোমধ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেছে এবং বর্তমানে উহা পাওয়া গেছে।

বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত সুরক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে, পরিবেশ মূল্যায়ন (ওপি/বিপি ৪.০১) (Environmental Assessment OP/BP 4.01) এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। যেহেতু রামগড় স্থল বন্দরের অবকাঠামো নির্মাণের বেশীরভাগ প্রভাব ঐ স্থানে নির্দিষ্ট এবং আদর্শ প্রশমন ব্যবস্থার মাধ্যমে হ্রাস করা সম্ভব, তাই প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বিশ্বব্যাংকের শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী ‘শ্রেনী খ’ এর আওতায় পরে। এই রামগড় স্থল বন্দরের পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (ইআইএ) প্রতিবেদনটি বিশ্বব্যাংকের নীতি মেনে তৈরি করা হয়েছে এবং বিশ্বব্যাংকের অনুমোদন নেওয়া হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের নীতি অনুযায়ী স্টেকহোল্ডার এবং সর্বসাধারণের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে প্রকল্পটি সাধারণের দৃষ্টিগোচর করা হয়েছে।

প্রকল্পের বর্ণনা ঃ প্রস্তাবিত রামগড় স্থল বন্দরের অবস্থান বাংলাদেশের দক্ষিন পুর্ব দিকের সীমান্তে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার রামগড় উপ-জেলায় অবস্থিত। অন্যদিকে ভারতের নিকটতম সীমান্ত শহর হল ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থিত দক্ষিন ত্রিপুরা জেলার সাবরুম। প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকাটি প্রাকৃতিক ভাবে বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্তরেখায় প্রবাহিত ফেনী নদির পাড়ে অবস্থিত। ইতোমধ্যে ভারত সরকার ফেনী নদির উপর প্রকল্প এলাকার সাথেই একটি সেতু নির্মাণের কাজ করছে যা ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। রামগড়ের সাথে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা শহর, ঢাকা-চট্টোগ্রাম মহাসড়ক

হইতে চট্টোগ্রাম সমুদ্র বন্দর সংযোগ সড়ক, রাজধানী ঢাকা এবং দেশের অন্যান্য শহরের সাথে সুন্দর সড়ক সংযোগ রয়েছে। প্রকল্প এলাকাটি রামগড় উপ-জেলা অফিস ও পৌরসভা থেকে মাত্র ১.৫০ কিলোমিটার দুরে এবং পৌর এলাকার মধ্যেই অবস্থিত। রামগড় উপ-জেলা সদরে অবস্থিত পিডিবির বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বিতরণ ব্যবস্থাপনা থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়ে প্রস্তাবিত স্থল বন্দরের কার্যক্রম চালানো যাবে। প্রকল্প এলাকা ও তার আশেপাশে মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্কের সুবিধাও বিদ্যমান। বর্তমানে অত্র এলাকায় কোন শুল্ক ষ্টেশন বা ইমিগ্রেশন অফিস নেই, শুধুমাত্র মহামুনিপাড়ায় বিজিবি নিয়ন্ত্রীত বর্ডার আউটপোস্ট অবস্থিত যা প্রস্তাবিত স্থল বন্দরের অতিসন্নিকটে। উপজেলা পর্যায়ের সরকারী দপ্তর সমুহ প্রস্তাবিত স্থল বন্দরের কাছাকাছি জায়গায় অবস্থিত। প্রস্তাবিত বন্দরের চারিদিকে বসতবাড়ি ও সবুজ গ্রাম্য পরিবেশ বিদ্যমান। রামগড় উপজেলা, খাগড়াছড়ি পাহাড়ী জেলা সদর থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার এবং ফেনী সদর থেকে প্রায় ৬৫ কিলোমিটার দুরত্বে অবস্থিত। এই উপজেলায় কিছু সংখ্যক পাহাড়ি আদিবাসি সম্প্রদায়ের বাসস্থান আছে, তারমধ্যে কিছু প্রকল্প এলাকার মধ্যে ও কিছু প্রকল্প এলাকার ২/৩ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের জায়গার মধ্যে অবস্থিত। এই উপলক্ষে বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবিত বন্দরের উন্নয়নের জন্য ১০ একর জমি অধিগ্রহনের প্রক্রিয়া চলমান রেখেছে। প্রস্তাবিত জায়গাটি রামগড়-বাড়ইহাট সড়কের পাশেই অবস্থিত এবং পরবর্তীতে সুষ্ঠ সম্প্রসারণের জন্য সড়কের একই পার্শ্বে জমি অধিগ্রহনের সুযোগ রয়েছে। প্রস্তাবিত উন্নয়ন কাজের উপর ভিত্তী করে বর্তমান পরিবেশগত প্রভাব মুল্যায়ন প্রতিবেদনটি তৈরী করা হয়েছে।

পরিবেশগত ও সামাজিক বেসলাইন ঃ প্রকল্প এলাকার বৈশিষ্ট হলো ইহা উচ্চ জমি শ্রেনীর এবং সাধারনত পানিতে ডুবে যায় না। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রকল্প এলাকার উচ্চতা প্রায় ১৯.৫০ মিটার। ফেনী নদী প্রকল্প এলাকার একান্ত সন্নিকটে অবস্থিত। বাংলাদেশ জাতীয় দালান আইন ২০১৫ অনুসারে, প্রকল্প এলাকাটি ভুমিকম্প তীব্রতা এলাকা-৩ এ অন্তর্গত যাহা প্রখর তীব্র ভুমিকম্প এলাকা হিসেবে ধরা হয় যার প্রাথমিক তীব্রতা সহগ ০.২৮ জি. । প্রকল্প এলাকার মৃত্তিকা ও ভুমি প্রকৃতি বাংলাদেশের উত্তর ও পূর্ব পাহাড়ী এলাকার মতোই। এই এলাকার পাহাড় গুলোর ব্যবচ্ছেদ করলে বিভিন্ন ধরণের পাথরের স্তর দেখা যায়। সাধারণত, পাহাড়গুলো অত্যন্ত খাড়া এবং কিছু কিছু পাহাড় ক্ষুদ্র ও প্রায় সমতল। বেশীর ভাগ পাহাড়ের মাটি হলুদাভ-বাদামি থেকে গাঢ় বাদামি, সচ্ছিদ্র, ভঙ্গুর, মিশ্র, তীব্র খারকীয় এবং শুষ্ক প্রকৃতির। যাহোক, মাটির প্রকৃতি সাধারণত জটিল কারণ নিচু স্তরের জমাকৃত পাথরের মধ্যে বিভীন্ন ধরণের বালু, পলি মাটি এবং কাদার পরিমাণ বিভীন্ন, সেজন্য বিভীন্ন জায়গায় ক্ষয় বা ধ্বস সৃষ্টি হয়। এই এলাকার মাটির প্রকৃতি সাধারণত পাহাড়ের বাদামী মাটির মতই, ইহাতে জৈব পদার্থ বিদ্যমাণ এবং সাধারণ উর্বরতা কম। প্রকল্প এলাকার মধ্যে ও বাহিরে বসবাসের জন্য জমির ধরণ কৃষি বা অকৃষি জমি এবং বাহিরে জলাশয় আছে। প্রকল্প এলাকার পাশে অবস্থিত, ফেনী নদীর পাড়ে,পাড় সংরক্ষণ বাধ নির্মাণ করা হবে এবং কোন বর্জ্য পদার্থ নদীতে ফেলা হবে না তাই নদীর উপর কোন ক্ষতিকারক প্রভাব পড়বে না। প্রকল্প এলাকার মধ্যে বা এর বাইরে ১.০০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে কোন বনাঞ্চল নেই। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রকৃতি সংরক্ষণ তালিকা অনুযায়ী প্রকল্প এলাকার আশেপাশে প্রাপ্ত প্রাণী ও উদ্ভিদকুলের অবস্থান ন্যুনতম। প্রকল্পের কর্মকান্ড আশেপাশের জীববৈচিত্রের উপর কোন বিরুপ প্রভাব ফেলবে না কারণ নির্মাণ কর্মকান্ডের ফলে সৃষ্ট প্রভাব গুলো নিরুপনের জন্য ইএমপিতে বর্ণিত পর্যাপ্ত উপশমন ব্যাবস্থা গ্রহন করা হবে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জেলাওয়ারী পরিসংখ্যান ২০১১ অনুযায়ী, রামগড় উপজেলা ও খাগড়াছড়ি পাহাড়ী জেলায় জনসংখ্যার ঘনত্ব ২০১১ অনুযায়ী প্রতি বর্গকিলোমিটারে যথাক্রমে ২৪৯ ও ২২৩ এবং এই জেলা ও উপ-জেলার পরিবারের আকার যথাক্রমে ৪.৮০ থেকে ৪.৫৯ ।রামগড় উপ-জেলা ও খাগড়াছড়ি পাহাড়ী জেলার পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যার অনুপাত প্রায় ১.০৫। রামগড় উপ-জেলার উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠাণ গুলো হচ্ছে রামগড় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, মহামুনি বুদ্ধিষ্ট মঠ, রামগড় দক্ষিণেশ্বরী কালিবাড়ী ইত্যাদি। সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদনে প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের তালিকা এবং ক্ষতিগ্রস্ত জমি, স্থাপনা, ফসল, এবং গাছের তালিকা ইত্যাদি সমন্বয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে। ইহা ছাড়াও খাগড়াছড়ি পাহাড়ী জেলার রামগড় ও মাটিরাঙা উপ-জেলার ১৯০ পরিবারের থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকার মধ্যে ও বাইরে বাঙালী ও আদিবাসি সম্প্রদায়ের পুরুষ ও নারীগণ রক্ষণশীল সামাজিক নীতি মেনে আন্তরিকভাবে বসবাস করে। সামাজিক প্রভাব নিরুপণ প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্প সংলগ্ন এলাকার আশেপাশের প্রায় ২৭.৫৬% বাঙালী ও ১৭.২৪% আদিবাসি পরিবার বাস করে। তাদের মধ্যে ৫১.৭২% আদিবাসি ও ২২.৮৩% বাঙালী দৈনিক মজুরের কাজ করে। প্রায় ২২% বাঙালী ও ৭% আদিবাসি ব্যবসায়ী কিন্তু ১১% বাঙালী ও ৭% আদিবাসি

কৃষিজীবি। সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী আদিবাসিদের মধ্যে স্বাক্ষরতার হার ৭১% এবং বাঙালীদের মধ্যে স্বাক্ষরতার হার ৮০% কিন্তু জমি অধিগ্রহনের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য রচিত পূন-নিস্পত্তি কার্য পরিকল্পনা প্রতিবেদন অনুযায়ী আদিবাসিদের মধ্যে স্বাক্ষরতার হার ৮৬% এবং বাঙালীদের মধ্যে স্বাক্ষরতার হার ৬৮%। এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে আদিবাসিদের স্বাক্ষরতার হার প্রকল্পের আশেপাশে অবস্থিত আদিবাসিদের চেয়ে তুলনামূলক ভাবে ভাল। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে চাকুরীক্ষেত্রে নারীদের অসমতা কমে যাবে, প্রকল্প বাস্তবায়নের কর্মকান্ডে অংশগ্রহন বৃদ্ধি পাবে, সচেতনাতা বৃদ্ধি পাবে, প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে নারী ও শিশুদের প্রতি অযাচিত বল প্রয়োগের ঘটনাার প্রতিরোধ করা হবে, প্রকল্প বাস্তবায়নের সহযোগিতার ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নারীদের সংবেদনশীলতাকে প্রাধাণ্য দেয়া হবে।

স্টেকহোল্ডার বা জনসাধারণের পরামর্শ ও উহার প্রকাশনা ঃ গত ২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২০ তারিখে বেলা ১১.৩০ মিনিটে খাগড়াছড়ি পাহাড়ী জেলার রামগড় উপজেলায় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ৬০ জনেরও বেশী নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন যার মধ্যে জমি অধিগ্রহনের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে নারী ও পুরুষ প্রতিনিধি, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্থল বন্দর কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ঠ সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠাণের প্রতিনিধিবৃন্দ। উক্ত সভায় স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত থেকে প্রকল্প বাস্তবায়নের পক্ষে তাঁদের সুচিন্তিত মুল্যবান মতামত ব্যক্ত করেন।

সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব শনাক্তকরণ ঃ নির্মাণ কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে আশেপাশের জমির উপর সৃষ্ঠ প্রভাব, শব্দের তীব্রতার মান, বায়ুমানের পরিবর্তন, আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে পারে। ইহা ছাড়াও পানির ব্যবহার, পানির গুনগত মান এবং আশেপাশে অবস্থিত প্রাণী ও উদ্ভিদের উপর সামান্যই প্রভাব পড়বে। নির্মাণ কালীন সময়ে পরিবেশের উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী কার্যক্রমের মধ্যে ভূমি ভরাট বা উন্নয়ন; ভূমি খনন ও ভরাট; ভরাটের জন্য বালু বা মাটির ও বর্জ্য পদার্থের পরিবহণ; পাইলিং, কর্তন এবং ছিদ্রকরণ, ঢালাই কার্যক্রম; ইস্পাত নির্মিত অবকাঠামো উড্ডয়ন; আভ্যন্তরীন ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ; রঙীন ও মসৃন করা; অপ্রয়োজনীয় জিনিষ পরিহার করা; প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ; ভূমির সোন্দর্য্য বর্ধণও বনায়ন উল্লেখযোগ্য।

রামগড় স্থল বন্দরের কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে সৃষ্ট পরিবেশের উপর প্রভাব ও প্রকৃতি সনাক্ত করা হয়েছে। পরিবেশগত প্রভাব সনাক্তকরণ ও নিরসণের উপায় নির্ধারণের জন্য রামগড় স্থল বন্দরের বিভিন্ন কার্যক্রমকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুত উৎপাদন, যানবাহন চলাচল, প্রশাসনিক কার্যক্রম, মালামাল মজুদ ও স্থানান্তর। বন্দরের কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে সৃষ্ট প্রভাব গুলো তীব্র বা অপেক্ষাকৃত ন্যুন, সুপ্রভাব বা কুপ্রভাব, পরিবেশের উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী সব ধরণের উপাদান যেমন মৃত্তিকা, ভূপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভস্থ পানি, পানির গতি বিজ্ঞান, আবাহবিদ্যা, ভূমি ও পানির ব্যাবহার, পানি ও বাতাসের গুণাগুণ, বনজ ও প্রাণীকুলের অস্তিত্য, আর্থসামাজিক অবস্থা এবং শব্দের তীব্রতা। প্রাপ্ত ডাটা উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেল যে স্থল বন্দর নির্মাণ কালীন সময়ে পরিবেশের উপর সম্ভাব্য প্রভাব সৃষ্টিকারী উপাদান সমূহগুলি- বায়ু দুষণ, শব্দ দুষণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, দুর্ঘটনা ও স্বাস্থ্যবিধী, পানি দুষণ, শ্রমিক সমাগম, উচ্চ তাপমাত্রা, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও হ্রাস, আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন, নতুন ব্যাবসার সম্প্রসারণ, পারিবারিক ব্যায়, সামাজিক সৌন্দর্য, এবং অবকাঠামোগত সুবিধা। প্রস্তাবিত প্রকল্পের জায়গায় অবস্থিত অবকাঠামো সমূহ, শাক্ শব্জির চাষাবাদ, শ্বশাণ ঘাট প্রভৃতির উপর সৃষ্টপ্রভাব ও তার প্রতিকার ব্যবস্থা রামগড় স্থলবন্দরের পূন-নিস্পত্তি কার্য পরিকল্পনা প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে। এই স্থলবন্দরটির উন্নয়নের জন্য কোনও পাহাড় কাটা বা কোনও জলাভূমি ভরাটের প্রয়োজন হবে না।

পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যাবস্থাপনা ও প্রতিকার ব্যাবস্থা পরিকল্পনা ঃ বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ সর্বোত্তম ও যুক্তিসংগত ব্যয়ের উপর নির্ভর করে ন্যুনতম ব্যয়ে প্রতিকার ব্যবস্থা নির্ধারণ করে রামগড় স্থল বন্দর নির্মাণের পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থা পরিকল্পনা প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে। পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ও প্রস্তাবিত নিরীক্ষণ পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে বিভিন্ন কার্যক্রমকে তিন পর্বে ভাগ করা হয়েছে ঃ প্রাক নির্মাণ, নির্মাণ কালীন ও বন্দরের কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে। প্রকল্পের বর্তমান অবস্থায় প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যের উপর ভিত্তি করে পরিবেশ ও সামাজিক

ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার প্রভাব ও তার প্রতিকারের ব্যবস্থা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। বন্দর কর্তৃপক্ষ পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থা পরিকল্পনা প্রতিবেদনের পরামর্শ অনুযায়ী বন্দরের কার্যক্রম চালানোর জন্য প্রকল্প এলাকায় পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা উপদল গঠণ করিবেন।

দক্ষতা তৈরী ঃ ফলপ্রসূ ভাবে পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষার চাহিদাগুলোর কার্যকরীভাবে প্রয়োগের জন্য দক্ষতা তৈরী ইএমপির একটি প্রধান উপাদান। বিএলপিএ, ইএন্ডএস সেল, সিএসসি এবং ঠিকাদারগণ সহ প্রকল্পের সকল স্তরের ক্ষেত্রে পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষামূলক ব্যবস্থাপনার জন্য দক্ষতা বাড়ানোর প্রয়োজন। নির্মাণের কাজের স্থানে, সিএসসি এর নেতৃত্বে দক্ষতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে, যদিও ঠিকাদাররা তাদের নিজস্ব কর্মী এবং কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার দায়িত্ব পালন করবে। দক্ষতা তৈরীর আওতায় রয়েছে সাধারণ পরিবেশগত ও সামাজিক সচেতনতা, এলাকার পরিবেশগত এবং সামাজিক সংবেদনশীলতা এবং প্রকল্পের ফলে সৃষ্ট প্রধান পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব, ইএমপির প্রয়োজনীয়তা, স্বাস্থ্য সচেতনাতার বিভিন্ন দিক এবং বর্জ্যের নিষ্পত্তি। এছাড়াও নির্মাণ কাজের এলাকায় বিভিন্ন পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য পরামর্শ মূল ইআইএ প্রতিবেদনে দেওয়া হয়েছে।

দলিল প্রস্তুত করা ঃ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসের পক্ষে সিএসসি এবং ঠিকাদারদের সহায়তায় ইএন্ডএস সেল পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থা পরিকল্পনা প্রতিবেদনে উল্লেখিত সমস্ত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করবেন। নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময়ে উক্ত তথ্য উপাত্ত সমন্বয় করে মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং বাৎসরিক প্রতিবেদন আকারে প্রকল্প পরিচালক বরাবর জমা দেওয়া হবে। বন্দরের কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রতিবেদন আকারে বন্দর কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করার জন্য বন্দর কর্তৃপক্ষ রামগড় বন্দরে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের মধ্য হতে নির্ভরযোগ্য কাউকে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করবেন। যার মধ্যে প্রকল্পের সামগ্রিক পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবগুলির সংক্ষিপ্তসার হিসেবে থাকবে।

ইএমপি বাস্তবায়নের ব্যয় ঃ পরিবেশগত প্রভাব প্রশমন করতে প্রাক্কলিত বিশদ ব্যয় মূল ইআইএ প্রতিবেদনে দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র প্রকল্পের এই পর্যায়ে নির্মীয়মাণ কার্যক্রমের জন্য পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ও পর্যবেক্ষণের জন্য মোট ব্যয় হবে ১২,০৪০,০০০.০০ টাকা। এই ব্যয়টি সম্ভাব্যতা যাচায়ের ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত নয় তবে দরপত্র দলীল প্রস্তুতির সময় অন্তরভুক্ত করা হবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ঃ স্থল বন্দরের দুর্যোগ বলতে প্রধানত দুইটি বিপদ উল্লেখযোগ্য। ইহার একটি কর্মসংস্থানের জটিলতা, কারণ স্থল বন্দরের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের মালামাল আমদানি ও রপ্তানি হয়ে থাকে এবং উক্ত বিভিন্ন ধরণের মালামালের লোডিং ও আনলোডিং প্রক্রিয়াও বিভিন্ন হয়ে থাকে। স্থল বন্দরের কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে সাধারনত অসাবধানতা বশতঃ অগ্নিকান্ড, অযাচিত বিস্ফোরণ, বিষাক্ত দ্রব্যের নিঃসরণ এবং পরিবেশ বিপর্যয় প্রভৃতি বিপদের আশংকা থাকে।

এই প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়ে জরুরী প্রতিক্রিয়া সিস্টেম সন্নিবেশিত করা হবে যার দ্বারা বিপদজনক দ্রব্যের হ্যান্ডলিং, অযাচিত ধূলিকণার নিঃসরণ, গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অগ্নিকান্ড এবং আঘাত প্রাপ্ত বা আহতদের ব্যাপারে তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহন করা। এখানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জরুরী প্রতিক্রিয়া কর্মিদল, সুনির্দিষ্ট সম্ভাব্য ঘটনা মোকাবেলার পরিকল্পনা এবং সম্ভাব্য দুর্ঘটনা মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি মজুদ রাখা। কোন দর্ঘটনা ঘটলে জরুরী প্রয়োজনে তৎক্ষণাত প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহন করে তা নিৎরসনের ব্যবস্থা করা হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা: প্রকল্প বাস্তবায়নের নেতৃত্ব দেবে প্রকল্প বাস্তবায়ন শাখা (পিআইইউ) যা ইতিমধ্যে বিএলপিএর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পিআইইউ প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত বিভিন্ন কাজের অংশগুলো সম্পন্ন করার জন্য যেমন সম্ভাব্যতা যাচাই এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন প্রস্তুতকারক পরামর্শদাতা নিয়োগের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। পিআইইউর নেতৃত্বে রয়েছেন প্রকল্প পরিচালক (পিডি)। যোগ্য ও অভিজ্ঞকর্মী সহ পরিবেশগত ও সামাজিক (ইএন্ডএস) সেল নিয়ে পিআইইউ গঠিত। এই ইএন্ডএস সেল পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলিতে পিআইইউকে সহায়তা করবে এবং নির্মাণ কাজ তদারকির পরামর্শদাতা (সিএসসি) ও ঠিকাদারদের তদারকি করবে। নির্মাণকাজের সম্পূর্ণ সময়ে ইএমপি অনুসরন করার

ত্রৈমাসিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনগুলি সংকলন করে প্রকল্প পরিচালক এবং বিশ্ব ব্যাংকের কাছে উপস্থাপন করবে। ইএন্ডএস সেল প্রকল্পের নির্মাণ এবং কার্যক্রম চলাকালীন উভয় পর্যায়ের কাজ পরিবেশগত ভাবে আনুসরন করা হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণের দ্বায়িত্বে থাকা বিএলপিএ এর কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। তদুপরি, বিএলপিএ প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য স্থায়ী পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ নিয়োগ বা সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করবে, যারা কার্যক্রম শুরু হলে এবং রক্ষণাবেক্ষণের সময় পরিবেশগত প্রশমন ব্যবস্থার তদারকি করার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে।

অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া ঃ বিএলপিএ তার বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে প্রকল্পের জন্য একটি অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া (জিআরএম) চালু করেছে। এই প্রকল্পের জন্য একটি দুই স্তরের অভিযোগ প্রতিকার কমিটি (জিআরসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম স্তর বন্দর ব্যবহারকারী ও পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্তদের সমন্বয়ে এবং দ্বিতীয়টি স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে। প্রথম স্তরে বন্দরের একজন কর্মকর্তাকে প্রধান করে সাত সদস্যের অভিযোগ প্রতিকার কমিটি গঠন করা হবে। তিনজন সদস্য বন্দরে কর্মরত কর্মচারী/শ্রমিক ও তিনজন বন্দর ব্যবহারকারী ও বন্দর সংলগ্ন অধিবাসিদের প্রতিনিধি যার মধ্যে একজন স্থানীয় উপজাতি থাকবে। যে কোন অভিযোগকারী মৌখিক বা লিখিতভাবে তার সমস্যার/অভিযোগের কথা জানাতে পারবে। মৌখিক অভিযোগ গ্রহণের জন্য একটি টোল ফ্রি নম্বর স্থাপন করা হবে। লিখিত অভিযোগ ডাকযোগে/কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে/লোক মারফত অথবা প্রকল্প অফিস সংলগ্ন স্থানে স্থাপিত অভিযোগ বাক্সে দাখিল করতে পারবে। পরিবেশ ও সামাজিক সমস্যা সম্পর্কিত অভিযোগগুলি নিয়ে কাজ করার সময় এই কমিটি সিএসসি এবং ইএন্ডএস সেলের পরিবেশ ও সামাজিক বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবে। দ্বিতীয় স্তরে এই প্রকল্পের পরিচালক, বিএলপিএর জিআরএম অফিসার (বিএলপিএ এর বোর্ডে ইতিমধ্যে একজন জিআরএম অফিসার রয়েছে) এবং জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থানীয় এবং ক্ষতিগ্রস্থদের সাথে যোগাযোগ করা হবে যার বিষদ বিবরণ মূল পতিবেদনে প্রদান করা হয়েছে।

উপসংহার ও সুপারিশ সমুহ ঃ বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রচলিত আইন, বিধি বিধান ও বিশ্বব্যাকের প্রদত্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে অনুসরণ করে এই ইএসআইএ প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা করা হয়েছে। বায়ু দুষণ, শব্দ দুষণ, কঠিণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, দুর্ঘটনা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ইত্যাদিকে সম্ভাব্য পরিবেশ ও সামাজিক ঝুকি হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। স্থল বন্দর নির্মাণ ও কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে অগ্নিকান্ড, বর্তমানে চলমান করোনা-১৯ মহামারীকে প্রাধান্য দিয়ে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার ব্যবস্থা এবং বায়ু ও শব্দ দুষণ হচ্ছে প্রধান সম্ভাব্য প্রভাব। যে কোন ধরণের দর্ঘটনা ও বিপর্যয় মোকাবেলার জন্য দক্ষ ও প্রশিক্ষিত অগ্নি নির্বাপক দল ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞ সর্বদা নিয়োজিত থাকবে।

যাহোক, যে কোন ধরণের অবকাঠামো উন্নয়ন কাজের ফলে পরিবেশের উপর কিছু না কিছু বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সম্ভাব্য পরিবেশ ও সামাজিক ঝুকির ব্যাপারে এই সমীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লেখিত সুপারিশ সমুহ যদি সঠিক ও কঠোর ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ, অনুসরণ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বজায় রাখা যায় তাহলে উন্নয়ন প্রকল্পের সুফল জাতীয়ভাবে ও মানবীয় কল্যাণে অর্থপূর্ণ টেকসই প্রকল্প হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে। এই স্থলবন্দরটির উন্নয়নের জন্য কোনও পাহাড় কাটা বা কোনও জলাভূমি ভরাটের প্রয়োজন হবে না।

স্থায়ী টেকসই প্রকল্পে উন্নিত করার জন্য বেশ কয়েকটি পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব বিবেচনা সম্পকের ব্যাপকভাবে মনোযোগ দেয়া দরকার। তাদের মধ্যে নিম্মলিখিত উন্নয়ন প্রস্তাবনা গুলো উল্লেখ করা হল ঃ

- বন্দর কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন সবকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা যেমন বিশ্ব ব্যাংক, স্থানীয় সবকার/প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, শুল্ক অধিদপ্তর, বিজিবি, পরিবেশ অধিদপ্তর ও অন্যান্যদের পূর্ণ সহযোগিতা করা উচিত;
- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/সংস্থা/ব্যক্তি ইএসএমপিতে উল্লেখিত সুপারিশ সমুহ সময়মত সঠিকভাবে প্রয়োগ করা উচিত;
- বন্দর সংশ্লিষ্ট এলাকায় বায়ু দুষণ, শব্দ দুষণের মাত্রা সবসময় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত ন্যুনতম মাত্রার নীচে রাখতে হবে;
- বন্দর এলাকায় বায়ু দুষণের মাত্রা, মাটির গুণাগুণ, অবস্থিত খাল ও নদীর পানি, পানীয় জলের গুণাগুণ নিয়মিত ভাবে পরীক্ষা করা;
- চাকুরী প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয়দের প্রাধান্য দিতে হবে।